Study Materials for U.G. 1st Semester Major (POLSCDSC-101)
Title of the Course: Constitutional Government in India
Module-3
Submitted by – Mrs. Piyali Saha
Department of Political Science
Shree Agrasen Mahavidyalaya
Book Resources: ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, অনাদিকুমার মহাপাত্র

ভারতের কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য গুলির মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

ভূমিকা (Introduction):

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক । যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলতে এক দ্বৈত সরকারী ব্যবস্থাকে বোঝায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বা কেন্দ্রীয় সরকার থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অঙ্গরাজ্যের সরকার থাকে। উভয় ধরনের সরকারের মধ্যে ক্ষমতা ও এক্তিয়ারের পরিধি এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার। তা না হলে অব্যবস্থা, দায়িত্বহীনতা এবং কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলবে। এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষমতা বন্টন করা হয়। সংবিধানের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ক্ষমতার বন্টন হল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম স্বীকৃত নীতি ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে কোন স্থায়ী ও সর্বজনগ্রাহ্য নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ সংশ্লিষ্ট দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের স্তর, অগ্রগতির পর্যায়, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রভৃতির উপর ক্ষমতার বন্টন ও কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের প্রকৃতি নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক হল একটি গতিশীল বিষয়। পরিবেশ ও পরিস্থিতির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ধারা স্থিরীকৃত হয়। পরিস্থিতি-পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে ক্ষমতার বন্টন ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে; অর্থাৎ কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে। এ কথা সকল যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সকল যুক্ত-রাষ্ট্রেই কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক হল একটি পরিবর্তনশীল ও গতিশীল বিষয়।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক:

বিতর্ক সত্ত্বেও কাঠামোগত বিচারে ভারতের শাসনব্যবস্থা হল যুক্তরাষ্ট্রীয়। গণপরিষদে বিতর্কের প্রাক্কালে ডঃ আম্বেদকর বলেছেন যে, ভারতের সংবিধান দ্বৈত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে এবং কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে আলাদাভাবে ক্ষমতা ন্যস্ত করেছে। সংবিধানই কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলি সৃষ্টি করেছে। এবং এই সংবিধানই হল উভয় ধরনের সরকারের যাবতীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস। রাধাকৃষ্ণণ (S. Radhakrishnan) বলেছেন: "Our Constitution has provisions defining and regulating the relationship between the Union and the States and their mutual obligations." ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়টি যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অন্য কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে এত বিস্তারিতভাবে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ব্যবস্থা করা হয় নি। বস্তুত ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান ও তার প্রয়োগ পর্যালোচনা করেছেন, আনুষঙ্গিক সমস্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতারা ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর পরিস্থিতি এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তবে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায়ও কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিষয়টি হল একটি গতিশীল বিষয়। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিকাশের সঙ্গে ভারতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ধারায় পরিবর্তন ঘটেছে এবং ঘটছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের তিনটি দিক আছে। এগুলি হল আইন, শাসন ও রাজস্ব সম্পর্কিত ক্ষমতার বন্টন। ক্ষমতা বন্টনের এই তিনটি দিক সম্পর্কে স্বতন্ত্র ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা দরকার।

যুক্তরাষ্ট্রে আইন বিষয়ক ক্ষমতার বন্টন (Distribution of Legislative Powers in a Federation):

যুক্তরাষ্ট্র হল এক দ্বৈত-শাসনব্যবস্থা বা দ্বৈত-সরকারী ব্যবস্থা। একদিকে থাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এবং অপরদিকে থাকে অঙ্গরাজ্যগুলির সরকার। এই উভয় ধরনের সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে ক্ষমতার বন্টন একান্তভাবে অপরিহার্য। তা না হলে দায়-দায়িত্ব ও এক্তিয়ারগত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দেবেই। এবং সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল ও বিপন্ন হয়ে পড়বে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বন্টন হল একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য তথা একটি সমস্যা। এই সমস্যার সঠিক সমাধান ব্যতিরেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করা যাবে না। দেশ ও কাল ভেদে কেন্দ্র-

রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। তবে সাধারণভাবে যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দুটি স্বীকৃত নীতি বা পদ্ধতির কথা বলা হয়।

(১) কেন্দ্রকে নির্দিষ্ট ক্ষমতা এবং অঙ্গরাজ্যগুলিকে অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদান:

একটি পদ্ধতি হল সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দিয়ে অবশিষ্ট ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে ন্যস্ত করা। এই পদ্ধতি অনুসারে সংবিধানে কেন্দ্রের ক্ষমতা সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত থাকে। অপরদিকে অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে অনির্দিষ্ট বা অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) অর্পণ করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রে মূলত এই পদ্ধতি অনুসারে ক্ষমতা বন্টিত হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের ১ম অনুচ্ছেদেই যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা হিসাবে মার্কিন কংগ্রেসের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের ১০ম সংশোধন অনুসারে যে সমস্ত ক্ষমতা সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রকে দেয় নি বা রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করে নি সেই সমস্ত ক্ষমতা রাজ্যগুলির হাতে ন্যস্ত থাকবে। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্দিষ্ট ক্ষমতা এবং অঙ্গরাজ্যগুলি অবশিষ্ট ক্ষমতা ভোগ করত। পূর্বতন সোভিয়েত সংবিধানের ৭৬ ধারা অনুসারে যে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় আইনসভার হাতে ন্যস্ত ছিল সেগুলি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলি স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করত। অস্ট্রেলিয়ায়ও কেন্দ্রের হাতে নির্দিষ্ট ক্ষমতা এবং অঙ্গরাজ্যগুলির হাতে অবশিষ্ট ক্ষমতা আছে। কেন্দ্র কতকগুলি ক্ষেত্রে অনন্য ক্ষমতা (exclusive powers) এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যুগ্ম ক্ষমতা (concurrent powers) ভোগ করত। তবে যুগ্মক্ষমতার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারের আইনের মধ্যে বিরোধ বাধলে কেন্দ্রের আইনই বলবৎ হয়। সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানেও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার ক্ষমতা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং অপরদিকে ক্যান্টনগুলির হাতে অবশিষ্ট ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে।

(২) রাজ্যগুলিকে নির্দিষ্ট ক্ষমতা এবং কেন্দ্রকে অবশিষ্ট ক্ষমতা প্রদান:

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বন্টনের দ্বিতীয় পদ্ধতিটি প্রথম পদ্ধতির বিপরীত। এই পদ্ধতি অনুসারে অঙ্গরাজ্যগুলিকে নির্দিষ্ট কতকগুলি বিষয়ে অনন্য ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এবং অন্যান্য বিষয়ে আইন প্রণয়নের সাধারণ ক্ষমতা কেন্দ্রকে প্রদান করা হয়। কানাডার সংবিধানে ক্ষমতা বন্টনের এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়েছে। কানাডায় আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত ক্ষমতাগুলিকে কেন্দ্রীয় তালিকা ও রাজ্য তালিকা এই দুটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্রকে এবং রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ে রাজ্যকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রকে।

কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার ক্ষমতার বন্টন (Distribution of legislative powers between the centre and the states):

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হল কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আইন-বিভাগীয় ক্ষমতার বন্টন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রকে নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্ষমতা প্রদান করে অবশিষ্ট সকল ক্ষমতা রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে। কানাডার সংবিধানে রাজ্যের ক্ষমতাকে নির্দিষ্ট করে অবশিষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে। ক্ষমতা বন্টনের এই দুটি পদ্ধতির কোনটিই ভারতে গৃহীত হয় নি। তবে এক্ষেত্রে কানাডীয় পদ্ধতি ও ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের প্রভাব অনস্বীকার্য। ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফসিলে (Seventh Schedule) এবং ২৪৫-২৫৫ ধারায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে আইন বিষয়ক সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ক্ষমতা বন্টন:

ভারতের বর্তমান সংবিধানের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টন ব্যবস্থার উপর ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সংশ্লিষ্ট বিধিব্যবস্থার সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই আইনের ৭ম তফসিলভুক্ত অংশে তিনটি তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়। তালিকা তিনটি হল কেন্দ্রীয় তালিকা, প্রাদেশিক তালিকা এবং যুগ্ম তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকায় ৫৯টি বিষয় ছিল। সর্বভারতীয় বিচারে শুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি ছিল কেন্দ্রীয় তালিকায়। এই বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, মুদ্রা প্রচলন, বৈদেশিক বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, রেল ব্যবস্থা প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের অনন্য ক্ষমতার অধিকারী ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। প্রাদেশিক তালিকায় ছিল ৫৫টি বিষয়। এই বিষয়গুলি আঞ্চলিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জনশৃঙ্খলা, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, ভূমি রাজস্ব প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়ে রাজ্যগুলির এক্তিয়ার ছিল। যুগ্মতালিকায় ছিল ৩৬টি বিষয়। এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, সংবাদপত্র প্রভৃতি। এই সমস্ত বিষয়ে কেন্দ্র-রাজ্য উভয়ের এক্তিয়ার ছিল। এই তিনটি তালিকার বহির্ভূত অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ ন্যস্ত ছিল গভর্নর জেনারেলের হাতে।

১৯৩৫ সালের আইনে কেন্দ্রের প্রাধান্য:

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনেও কেন্দ্রপ্রবণতা ছিল প্রবল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হত এবং এরকম প্রাদেশিক আইন বাতিল হয়ে যেত। যুগ্মতালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে কেন্দ্র আইন প্রণয়ন করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাদেশিক আইনসভার আইন প্রণয়নের এক্তিয়ার আর থাকত না। জরুরী অবস্থার সময়ে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিসাপেক্ষে কেন্দ্র প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারত। বস্তুত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে বিশেষ শক্তিশালী এক কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

তিনটি তালিকার মাধ্যমে ক্ষমতা বণ্টন:

মূলত এই ১৯৩৫ সালের আইনকে অনুসরণ করে ভারতের বর্তমান সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের এই ক্ষমতা বন্টন ব্যবস্থা অত্যন্ত বিশদ। অন্য কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় এত বিস্তারিতভাবে কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয় নি। ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফসিলে (Seventh Schedule) তিনটি তালিকার মাধ্যমে যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে ক্ষমতা বণ্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সপ্তম তফসিলে উল্লিখিত তালিকা তিনটি হল: (১) কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List), (২) রাজ্য-তালিকা (State List) এবং (৩) যুগ্মতালিকা (Concurrent List)।

(১) কেন্দ্রীয় তালিকা:

মূল সংবিধানে কেন্দ্রীয় তালিকায় ৯৭টি বিষয় ছিল। পরে এই তালিকার কিছু রদবদল ঘটে। ষষ্ঠ সংবিধান সংশোধন (১৯৫৬)-এর মাধ্যমে ১১ক বিষয়টি সংযুক্ত হয়। সংবিধানের সপ্তম সংশোধন (১৯৫৬)-এর মাধ্যমে ৩৩নং বিষয়টি প্রত্যাহৃত হয়। সংবিধানের ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬)-এর মাধ্যমে ২ক বিষয়টি এবং ৪৬তম সংবিধান সংশোধন (১৯৮২)-এর মাধ্যমে ৯২থ বিষয়টি সংযুক্ত হয়। সংবিধানের ৮৮তম সংশোধন (২০০৩)-এর মাধ্যমে ১২গ বিষয়টি সংযুক্ত হয়। সুতরাং বর্তমানে গাণিতিক বিচারে কেন্দ্রীয় তালিকায় মোট ১০০টি বিষয় আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য মার্কিন সংবিধানে মাত্র ১৮টি বিষয় কেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার হল জাতীয় স্বার্থের রক্ষক। তাই জাতীয় স্বার্থ-জড়িত বিষয়সমূহ কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভারতে কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, রেল, ডাক ও তার, মুদ্রাব্যবস্থা, বীমা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, যুদ্ধ ও শান্তি, পারমাণবিক শক্তি, নাগরিকতা, লোকগণনা প্রভৃতি। কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলিতে কেবলমাত্র পার্লামেন্টই আইন প্রণয়ন করতে পারে [২৪৬(১১) ধারা)। রাজ্য আইনসভার এগুলিকে স্পর্শ করারও ক্ষমতা নেই।

(২) রাজ্য তালিকা:

মূল সংবিধানে রাজ্য-তালিকায় ছিল ৬৬টি বিষয়। তারপর এই তালিকার বিষয়েও কিছু রদবদল হয়। সংবিধানের সপ্তম সংশোধন (১৯৫৬)-এর মাধ্যমে ৩৬নং বিষয়টি প্রত্যাহৃত হয়। আবার সংবিধানের ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬)-এর মাধ্যমে ১১, ১৯, ২০ এবং ২৯নং বিষয়গুলি রাজ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। সুতরাং গাণিতিক বিচারে বর্তমানে রাজ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সংখ্যা হল ৬১টি। সাধারণত আঞ্চলিক স্বার্থ ও সমস্যা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ রাজ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পুলিশ, আইন-শৃঙ্খলা, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব, জনস্বাস্থ্য, স্বায়ত্তশাসন, পূর্ত, জল সরবরাহ, রাস্তাঘাট, কৃষি, মৎস্য চাষ প্রভৃতি। সাধারণভাবে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যের আইনসভার হাতেই ন্যস্ত আছে। তবে কেন্দ্রীয় তালিকা ও যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতার দ্বারা অঙ্গরাজ্যের আইনসভার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ [২৪৬(৩) ধারা]।

(৩) যুগ্ম তালিকা:

ভারতীয় সংবিধানের যুগ্ম তালিকাটিও মোটামুটি দীর্ঘ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৯৮৭ সালের কানাডার সংবিধানের যুগ্মতালিকায় মাত্র ২টি বিষয়ের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। তবে অস্ট্রেলিয়ার সংবিধানে যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সংখ্যা ৩৯। ভারতের মূল সংবিধানে যুগ্মতালিকায় ৪৭টি বিষয় ছিল। তারপর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবিধানের ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬)-এর মাধ্যমে ১১ক, ১৭ক, ১৭খ, ২০ক এবং ৩৩ক বিষয়গুলি যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার ফলে গাণিতিক বিচারে বর্তমানে যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫২। যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বিবাহ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ, সংবাদপত্র, শ্রমিক কল্যাণ, শ্রমিক সংগঠন, শিক্ষা, পুস্তক ও প্রেস, বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রভৃতি। যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়কেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তবে রাজ্য আইনসভার ক্ষমতা এক্ষেত্রেও পার্লামেন্টের অনন্য ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ (২৪৬ (২) ধারা)। যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয়

আইনের সঙ্গে রাজ্য আইনের বিরোধ বাধলে কেন্দ্রীয় আইনটি বলবৎ হয় এবং কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে রাজ্য আইনের অসঙ্গতিপূর্ণ অংশ বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে যদি রাজ্য আইনের বিরোধ বাধে তাহলে কেন্দ্রের আইন বলবৎ হয়। তবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য আইনটি যদি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে, তাহলে সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সেই রাজ্যে আইনটি বলবৎ হবে। বমওয়াল (K. R. Bombwall)-এর মতানুসারে দীর্ঘ যুগ্মতালিকার মাধ্যমে ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা ভারতে সমবায়িক যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁরা অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। তিনি তাঁর The Foun-dation of Indian Federalism গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "By creating a considerable field of shared or concurrent jurisdiction, the Indian Constitution has taken advantage of older federation and has laid down a pattern of co-operative federalism."

সমালোচনা:

অন্য কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রকে রাজ্য-তালিকায় হস্তক্ষেপ করার এই ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। শ্রী অশোক চন্দ তাঁর Federalism in india: A Study of Union-State Relations গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "There is no such derogation to the States' authority in any other federal constitution." সমালোচকদের মতানুসারে ভারতীয় সংবিধানের ২৪৯ ধারা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরোধী। বমওয়াল বলেছেন: "...it is unprecedented in that is vests in a house of the Federal legislature the power by unilateral action to transfer to the latter powers reserved by the constitution to the states." "জাতীয় স্বার্থ"-এর ধারণা অতিমাত্রায় অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ও নমনীয়।রাজ্যসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনযুক্ত ক্ষমতাসীন দল জাতীয় স্বার্থের অজুহাতে সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে ২৪৯ ধারার ক্ষমতাকে ব্যবহার করতে পারে। তাই এই ব্যবস্থা অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যের এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় রীতিনীতির বিরোধী। রাজ্য আইনসভা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগেই কোন আইন পাস করে থাকলে তা বাতিল হয়ে যায়।

(২) জরুরী অবস্থায় পার্লামেন্টের হাতে ক্ষমতা আসে:

জরুরী অবস্থার সময় পার্লামেন্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে (২৫০ ধারা)। জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে পার্লামেন্ট সমগ্র ভারতের বা ভারতের কোন অঞ্চলের জন্য রাজ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হওয়ার পর ছ'মাস পর্যন্ত এই আইন বলবৎ থাকতে পারে। জরুরী অবস্থায় পার্লামেন্টের এই ক্ষমতা রাজ্য তালিকাকে যুগ্মতালিকায় পরিণত করে। কারণ তখন কেন্দ্র-রাজ্য উভয়েই রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে জরুরী অবস্থার প্রাক্কালে ভারত একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার কিছু বাড়তি ক্ষমতা ভোগ করে। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়।

(৩) কেন্দ্রের আইন ও রাজ্যের আইনের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের আইন প্রাধান্য পায়:

জাতীয় স্বার্থে এবং জরুরী অবস্থায় পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইনের সঙ্গে কোন রাজ্য আইনের অসঙ্গতি হলে পার্লামেন্টের আইনই বলবৎ হবে এবং পার্লামেন্টের সংশ্লিষ্ট আইন বলবৎ থাকাকালীন সময়ে রাজ্য আইনের অসঙ্গতিপূর্ণ অংশ প্রযুক্ত হবে না (২৫১ ধারা)। অর্থাৎ উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে রাজ্যের আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয় না বা বাতিল হয়ে যায় না। তবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের এই প্রাধান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিরোধী। এতে অঙ্গরাজ্যগুলির সাংবিধানিক অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ভিন্ন দলের সরকার ক্ষমতাসীন থাকলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যসরকারকে বিপন্ন করার জন্য এই ক্ষমতা ব্যবহৃত হতে পারে।

(৪) রাজ্যের অনুরোধে কেন্দ্রের আইন প্রণয়ন:

দুই বা ততোধিক রাজ্য আইনসভা প্রস্তাব গ্রহণের মাধ্যমে অনুরোধ করলে পার্লামেন্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে স্বাভাবিক অবস্থাতে আইন প্রণয়ন করতে পারে (২৫২ ধারা)। এই আইন কেবলমাত্র অনুরোধকারী রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবে অন্য রাজ্য ইচ্ছা করলে আইনটি গ্রহণ করতে পারে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য এই আইনের কোন পরিবর্তন করতে পারে না। পার্লামেন্টই কেবল সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন বা বাতিল করতে পারে। অস্ট্রেলিয়াতেও রাজ্যগুলির আইনসভা তাদের ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভাকে অনুরোধ করতে পারে।

(৫) আন্তর্জাতিক চুক্তি প্রয়োগের জন্য আইন প্রণয়ন:

কোন আন্তর্জাতিক সন্ধি, চুক্তি বা অঙ্গীকার এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য পার্লামেন্ট রাজ্য তালিকাভুক্ত যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে (২৫৩ ধারা)। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন করে এবং দেশ ও জাতির প্রতিনিধিত্ব করে। এই কারণে আন্তর্জাতিক

অঙ্গীকারসমূহ রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে এই ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তবে পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন না করে ভারতের কোন অংশ অন্য রাষ্ট্রকে প্রদান করতে পারে না বা অন্য রাষ্ট্রের কোন অংশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে না।

(৬) রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার কারণে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে পার্লামেন্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারে (৩৬৫ ধারা)।

(৭) আরও একভাবে কেন্দ্র রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে অনুপ্রবেশ করতে পারে। রাজ্যপাল ইচ্ছা করলে রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রণীত যে-কোন বিলকে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য আটকে রাখতে পারেন। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া রাজ্য বিলটি আইনে পরিণত হতে পারে না। রাষ্ট্রপতির নামে ক্ষমতাটি কার্যত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাই ভোগ করে।

(৮) কেন্দ্র যে-কোন শিল্প, রাজপথ, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে ঘোষণা করতে পারে। তখন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়।

মূল্যায়ন (Evaluation):

ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে আইন বিষয়ক ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্ট।

(১) প্রাথমিক বন্টন ব্যবস্থাতেই অধিক সংখ্যক এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ কেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে। হোয়ার মন্তব্য করেছেন: "Powers granted in the exclusive Union List and in the Concurrent List cover.....almost all subjects of importance and what is left to the exclusive authority of the States tends to be of subordinate concern." কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয় রাজ্যগুলির নাগালের বাইরে। আর যুগ্মতালিকার ক্ষেত্রে ত বটেই, এমনকি রাজ্যতালিকার ক্ষেত্রেও রাজ্যগুলির ক্ষমতা কেন্দ্রের অনন্য ক্ষমতার দ্বারা সীমাবদ্ধ।

(২) তিনটি তালিকার বহির্ভূত সকল ক্ষমতা, অর্থাৎ অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ (Residuary Powers)-@ কেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে। এর ফলেও কেন্দ্রের ক্ষমতা অ-নির্দিষ্ট হয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে। এম. সি. শিতলবাদ (M. C. Setalvad) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আইন বক্তৃতায় (Tagore Law Lectures) বলেছেন: "(The framers of the Constitution) wanted a strong Centre, and naturally vested the residuary power in the Centre."

(৩) আবার ৭ম এবং ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাজ্যতালিকা থেকে পাঁচটি বিষয় বাদ দিয়ে যুগ্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তার ফলে কেন্দ্রের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) তা ছাড়া স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যে-কোন অবস্থায় কেন্দ্রকে রাজ্য তালিকায় হস্তক্ষেপের সুযোগ দেওয়ায় রাজ্যগুলির আইন বিষয়ক ক্ষমতা আরও সঙ্কুচিত হয়েছে। জাতীয় স্বার্থে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন এবং রাজ্যবিলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি সম্পর্কিত ক্ষমতা কেন্দ্র ভিন্ন দলের রাজ্যসরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বার্থে প্রয়োগ করতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে ১৯৫৮ সালে কেরল এডুকেশন বিলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ভূমিকার কথা বলা যায়। হোয়ার বলেছেন: "What makes one doubt that the Constitution of India is strictly and fully federal, are the powers of intervention in the affairs of the states given by the Constitution to the Central Government and Parliament." সারকারিয়া কমিশনের প্রতিবেদন মোতায়েক, ১০.১১.১৯৬৯ থেকে ৭.৬.১৯৮৪ তারিখের মধ্যে পনেরটি রাজ্য বিলকে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য আটকে দেওয়া হয়েছিল। তারমধ্যে ন'টি ক্ষেত্রে কেন্দ্র অনুমোদন দেয়নি। ছ'টি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল দেড় বছর বাদে; পাঁচটি ক্ষেত্রে তিন বছর বাদে; তিনটি ক্ষেত্রে ছ'বছর বাদে; এবং একটি ক্ষেত্রে বার বছর বাদে।

(৫) বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ্য-আইন প্রয়োগ করার জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন দরকার হয়। এই ব্যবস্থা কেন্দ্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ করে।

(৬) জরুরী অবস্থা প্রকৃতপক্ষে ভারতকে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করে। বস্তুত বর্তমান ক্ষমতা বন্টন ব্যবস্থার পরিণামে পার্লামেন্টের পর্যাপ্ত ক্ষমতা অনেক সময় সার্বভৌম ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্য কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইন সভা এত বেশী ক্ষমতাসম্পন্ন নয়।

(৭) এর পরেও পার্লামেন্ট রাজ্যতালিকার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে চলেছে। ফলে রাজ্যগুলি পৌরসংস্থার পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে। অঙ্গরাজ্যগুলির আইন প্রণয়নের সীমাবদ্ধ ক্ষমতাকে ক্রমান্বয়ে আরও সঙ্কুচিত করা হয়েছে।

জোহারী (J. C. Johari) মন্তব্য করেছেন: "The state legislatures have a very turncated area of authority and even that rump area has been further truncated area of authority and even that rump area has been further truncated by virtue of serious inroads whereby the parliament may make more and more encroachments upon the legislative jurisdiction of the states." সমালোচকদের অনেকের মতানুসারে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হতে হতে রাজ্যগুলি বহুলাংশে পৌরসংস্থার পর্যায়ে নেমে এসেছে।

(৮) হোয়ার তিনটি তালিকার মাধ্যমে ভারতের ক্ষমতা বন্টন ব্যবস্থাকে অকাম্যভাবে জটিল বলে মন্তব্য করেছেন। তালিকার সংখ্যা এবং তালিকার অন্তর্ভুক্ত ক্ষমতার সংখ্যা অধিক হলে কেন্দ্র–রাজ্যের মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। হোয়ার (K. C. Heare) তাঁর Modern Constitution গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "It is, indeed, difficult enough to interpret one list of subjects consistently. When a second or even a third is added the task of the courts becomes most complicated and confused." সংবিধান রচয়িতারা ক্ষমতা বন্টনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ও সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করলেই ভাল হত। অধ্যাপক হোয়ার বলেছেন: "It is unfortunate however, the (Constitutent) Assembly could not have adopted a much simpler and shorter method of dividing the powers."

(৯) ভারতের শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির ক্ষমতা সরাসরি তুলে নিতে পারে। কিন্তু অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে তা সম্ভব নয়। অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্কটাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের সীমা নির্ধারণের ক্ষমতা আদালতের হাতে ন্যস্ত থাকে। কে. ভি. রাও মন্তব্য করেছেন: "Our Constitution-makers were emphatic on the fact that they were creating a federal constitution of some sort. If this so, then Article 356 is an unfederal one."

পক্ষে অভিমত:

উপরিউক্ত সমালোচনাকে অনেকে স্বীকার করেন না। এম. ভি. পাইলীর মতে রাজ্যকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন: "....the states are not reduced to a position of insignificance in the scheme of division of powers." তিনি বরং জনস্বাস্থ্য, মৎস্য চাষ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাজ্যকে দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন। জি. এন. যোশী (G. N. Joshi)-র মতানুসারে রাজ্য তালিকাভুক্ত সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়ে সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় আইনের প্রয়োজন হতে পারে। তাঁর মতানুসারে বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও লক্ষ্যের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয় সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। এরকম ক্ষেত্রসমূহে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে পার্লামেন্টের আইন প্রণয়ন নিতান্তই স্বাভাবিক ও অপরিহার্য। পল অ্যাপেলবি (Appelby) কোন বিশেষ অঞ্চলে উদ্ভূত সমস্যাকে আঞ্চলিক সমস্যা হিসাবে গণ্য করাকে বোকামী বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতানুসারে জনস্বাস্থ্যের মত একটি বিষয়কে পুরোপুরি রাজ্যের হাতে ন্যস্ত করা ঠিক নয়। কোন একটি রাজ্যে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে নিকটবর্তী রাজ্যগুলিতেও সেই ব্যাধির আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। অঙ্গরাজ্যের সীমানার মধ্যে মহামারী সীমাবদ্ধ থাকে না। অ্যাপেলবি বলেছেন: "Almost all economic activities are carried on in localities but this fact does not make their significance local." বস্তুতপক্ষে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির ক্ষমতা পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পর–বিরোধী নয়। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রকৃতিগত বিচারে সহযোগিতামূলক। সংবিধানের ২৫২ ধারায় এই সহযোগিতামূলক প্রকৃতির প্রকাশ ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে সিং ও সাকসেনা তাঁদের Indian Politics শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "Broadly speaking, the division is based on the principles of subsidiarity and concurrency. By subsidiarity, it is meant that whichever level of Government can handle a particular subject more effectively is granted that subject. By concurrency, it is meant that the subjects in the twilight zone are allocated to both orders of Governments with laws made by the Parliament prevailing over those made by State legislatures in cases of conflict."

ক্ষমতা পুনর্বন্টনের দাবি:

যাইহোক ১৯৬৭ সালের পর বিভিন্ন রাজ্যে অ–কংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ক্ষমতা পুনর্বন্টনের দাবি উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরল, ত্রিপুরা এবং বর্তমানে কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্য এই দাবির সামিল হয়েছে। কে. শান্তানাম, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রেড্ডী রাজ্যের জন্য অধিক ক্ষমতার দাবিকে সমর্থন করেছেন। ১৯৭১ সালের রাজামান্নার কমিটিও ক্ষমতা পুনর্বন্টনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করেছেন। বিরুদ্ধবাদীরা জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় সংহতি এবং কেন্দ্রকে দুর্বল না করার যুক্তি বার বার দেখিয়েছেন। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন ও সম্পর্ক খতিয়ে দেখার জন্য ১৯৮৩ সালের মার্চ মাসে একজন সদস্যবিশিষ্ট সারকারিয়া কমিশন নিয়োগ করা হয়েছে।

উপসংহার:
প্রকৃত প্রস্তাবে, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন বিষয়ক ক্ষমতা বন্টনের বর্তমান অসমান ও অসন্তোষজনক অবস্থার পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন। অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্যের স্বার্থে এটা দরকার। ভারতের মত একটা বিশাল ও জনবহুল দেশে বিভিন্ন জাতির আশা-আকাঙক্ষাকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া আবশ্যক। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যকে স্থায়ী করতে এবং ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় করতে এটা দরকার। এত বড় একটি দেশে আইন বিষয়ক ক্ষমতার সঠিক বিকেন্দ্রীকরণ কাম্য বিবেচিত হয়। তা ছাড়া ভারতের নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টির পুনর্বিবেচনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার বন্টন (Distribution of Admin-istrative Powers between the Centre and the States)
প্রশাসনিক সম্পর্ক বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে । যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতার সুস্পষ্ট বন্টন একান্তভাবে দরকার। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও এই বন্টনব্যবস্থা অপরিহার্য। অন্যথায় এক্তিয়ারগত সমস্যা, দায়িত্বহীনতা প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে শাসন-বিভাগীয় সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অন্য কোন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে প্রশাসনিক সম্পর্ক নিয়ে এত বিশদভাবে আলোচনা করা হয় নি। তার ফলে শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন ব্যবস্থা অধিকতর জটিল হয়ে পড়েছে। শ্রীদুর্গাদাস বসু (D. D. Basu) তাঁর Introduc-tion to the Constitution গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন: "The distribution of executive powers be-tween the Union and the States is somewhat more complicated than that of the legisla-tive powers." এক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাদি অনুসৃত হয়েছে।

- **কেন্দ্র-রাজ্যের প্রশাসনিক এক্তিয়ার:**

ভারতীয় সংবিধানের ২৫৬ থেকে ২৬৩ ধারার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে প্রশাসনিক সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমেই কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসনিক এক্তিয়ার সম্পর্কে উল্লেখ করা দরকার। সংবিধানের ৭৩ ধারায় কেন্দ্রের এবং ১৬২ ধারায় রাজ্যের প্রশাসনিক এক্তিয়ার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক এক্তিয়ার সংসদের আইন সম্পর্কিত এক্তিয়ারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমগ্র ভারত জুড়ে কেন্দ্রের প্রশাসনিক এক্তিয়ার প্রসারিত। আবার সংবিধানে ভারতীয় রাজ্যক্ষেত্রের বাইরেও কেন্দ্রকে প্রশাসনিক এক্তিয়ার প্রসারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। অপরপক্ষে অঙ্গরাজ্যের সীমানার মধ্যেই রাজ্যের প্রশাসনিক এক্তিয়ার সীমাবদ্ধ। সংবিধানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে কেন্দ্র যে সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে সেই সকল বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন ক্ষমতা থাকবে। সন্ধি বা চুক্তির ব্যাপারে কেন্দ্রের যে সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার আছে সে সব বিষয়েও কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতা থাকবে (৭৩ ধারা)। যে-সব বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজ্যগুলির হাতে আছে, সে-সব বিষয়ে শাসন ক্ষমতাও রাজ্যগুলির হাতে থাকবে (১৬২ ধারা)। সাধারণভাবে যুগ্মতালিকাভুক্ত বিষয়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্যগুলির হাতেই থাকবে। তবে সংসদ আইন করে বিশেষ ক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রকে দিতে পারে।
প্রশাসনিক ক্ষমতা বন্টনের এই সাধারণ ব্যবস্থা ছাড়াও সংবিধানের কতকগুলি ধারায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে শাসন-বিভাগীয় সম্পর্ক বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১) সংসদীয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা:
বলা হয়েছে যে, রাজ্যের শাসনক্ষমতা এমনভাবে পরিচালিত হবে যাতে সংসদ প্রণীত বিভিন্ন আইন বা প্রচলিত অন্যান্য আইনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বজায় থাকে। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনগুলিকে কার্যকর করা রাজ্যগুলির প্রশাসনিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে দরকার মনে করলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারকে যে-কোন নির্দেশ দিতে পারে (২৫৬ ধারা)। শ্রী বসু মন্তব্য করেছেন: "It shall be the constitutional duty of every State to enforce union laws as are applicable in the State."

(২) কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা এবং কেন্দ্রের নির্দেশ দান:
রাজ্য সরকারগুলি তাদের শাসন ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করবে যাতে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনকার্য পরিচালনায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্র প্রয়োজনবোধে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে [২৫৭(২) ধারা]। কেন্দ্র আরও দু'টি ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। (ক) জাতীয় বা সামরিক স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সংরক্ষণের জন্য এবং (খ) রাজ্যের ভিতরে রেলপথ সংরক্ষণের জন্য। অনেকে এই ব্যবস্থাকে অধস্তন সহযোগিতার প্রকাশ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তবে এই সমস্ত কেন্দ্রীয় নির্দেশ পালনের জন্য রাজ্য সরকারের কোন অতিরিক্ত

ব্যয় হলে কেন্দ্রীয় সরকার সেই ব্যয়ভার বহন করবে। এই অতিরিক্ত ব্যয়ের ব্যাপারে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের যদি বিরোধ বাধে, তাহলে একজন সালিস (arbitrator)-এর মাধ্যমে তার মীমাংসা করতে হবে। ভারতের প্রধান বিচারপতি এই সালিসকে নিযুক্ত করবেন [২৫৭(৪) ধারা]। কেন্দ্র রাজ্যকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দেশ দিতে পারে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তফসিলী উপজাতিগুলির জন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রয়োগ [৩৩৯(২) ধারা); সংখ্যালঘু ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের সন্তান-সন্ততিদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা [৩৫০ক ধারা); হিন্দী ভাষার উন্নয়ন [৩৫১ ধারা] প্রভৃতি।

কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব সংক্রান্ত ক্ষমতার বন্টন (Distribution of Finan-cial Powers between the Centre and the States)

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সাফল্য কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বন্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। রাজস্ব বন্টন ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে না হয়। আর্থিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা ছাড়া রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন হতে বাধ্য। অধ্যাপক হোয়ার মন্তব্য করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যের হাতে এমন আর্থিক সঙ্গতি থাকা দরকার যাতে উভয় সরকার স্ব স্ব ক্ষমতা সঠিকভাবে প্রয়োগের সুযোগ পায়। কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির নিজ নিজ নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় আয়ের উৎস নির্দিষ্ট রাখাই হল আদর্শ ব্যবস্থা। বাস্তবে কিন্তু কর্তব্য ও আয়ের উৎসের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা সহজ ব্যাপার নয়। শান্তানাম যথার্থই বলেছেন: "The financial relation between the Centre and the Units are among the most difficult problems in a federation."

যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থা:

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বন্টনের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণই একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে শাসনতান্ত্রিক সুবিধার দিকটি (Administrative Expediency)-ও বিচার-বিবেচনা করা দরকার। এক্ষেত্রে করদাতাদের স্বার্থ, করনীতির সমতা, কর সংগ্রহের ব্যয় প্রভৃতি দিকগুলিকে অবহেলা করা যায় না। অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা থাকবে, উভয় সরকারের নিজস্ব দায়িত্ব সম্পাদনের উপযোগী আয়ের পর্যাপ্ততা (Adequacy) থাকবে এবং শাসনতান্ত্রিক সুবিধার দিকটিও বিবেচিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাধারণত যা করা হয় তা হল রাজস্ব সম্পর্কিত কতকগুলি বিষয়কে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে আলাদা করে দেওয়া হয়। এবং কতকগুলি বিষয়কে উভয় সরকারের যৌথ কর্তৃত্বাধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কেবল স্বকীয় রাজস্বের সূত্র থেকে অঙ্গরাজ্যগুলির নিজেদের প্রয়োজন মেটে না। তাই কেন্দ্রের দিক থেকে রাজ্যগুলিকে আর্থিক সাহায্য বা অনুদানের ব্যবস্থা করতে হয়। অঙ্গরাজ্যগুলির জন্য এই কেন্দ্রীয় অনুদান যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই কেন্দ্রীয় অনুদান স্বেচ্ছামূলক হতে পারে, আবার বাধ্যতামূলক হতে পারে। তেমনি আবার আলোচ্য অনুদান শর্তাধীন হতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় অনুদান স্বেচ্ছামূলক এবং শতাধীন হলে অঙ্গরাজ্যের স্বাধিকার বিপন্ন হতে পারে। অধ্যাপক হোয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন: "Grants if they are to rank as independent sources of revenue, must not depend, of course, upon the good will of the contributing government." মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র অঙ্গরাজ্যগুলিকে আর্থিক অনুদান দেয়।

১৯৩৫ সালের আইনের প্রভাব:

ভারতীয় সংবিধানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বিস্তারিতভাবে অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রভাব সুস্পষ্ট। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে রাজস্বের সূত্রগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় এবং কেন্দ্রের হাতে একটি ভাগ ও প্রদেশগুলির হাতে অপর একটি ভাগ ন্যস্ত করা হয়। তা ছাড়া কেন্দ্রকে কতকগুলি ক্ষেত্রে কর ধার্য ও সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এবং বলা হয় যে এই সমস্ত সূত্রে আদায়ীকৃত অর্থ কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে বন্টিত হবে। আলোচ্য আইনে প্রদেশগুলির হাতে ন্যস্ত আয়ের উৎস ছিল নিতান্তই কম ও সীমাবদ্ধ। এ হল সংশ্লিষ্ট আইনের একটি বড় ত্রুটি। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে মূলত ১৯৩৫ সালের আইনের সংশ্লিষ্ট বিধি-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে ব্রিটিশ আমলের আইনটির পরিচিত দোষ-ত্রুটিগুলিকে পরিহার করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বস্তুত এই কারণে সংবিধান রচয়িতারা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক বিস্তারিত ভাবে বিন্যস্ত করেছেন।

ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সম্পর্কের বিষয়টিকে আলোচনার সুবিধার্থে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বন্টন; (২) কেন্দ্রীয় অনুদান; (৩) ঋণ গ্রহণ এবং (৪) অর্থকমিশন।

(১) কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বন্টন:

ভারতে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতাকে দু'টি তালিকার মাধ্যমে বন্টন করা হয়েছে। এই দু'টি তালিকা হল কেন্দ্রীয় তালিকা ও রাজ্য তালিকা। রাজস্ব সম্পর্কিত এই দু'টি তালিকা সংবিধানের সপ্তম তফসিলে উল্লিখিত আছে।

রাজ্য তালিকা:

রাজ্য তালিকায় ১৯টি বিষয় আছে। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে রাজ্যগুলিকে অনন্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে ভূমিরাজস্ব। কৃষি আয়ের উপর কর; কৃষি জমির উত্তরাধিকারের উপর কর; খনিজ অধিকারের উপর কর; রাজ্যে উৎপাদিত দ্রব্যের উপর অস্ত্যশুল্ক, পান করার মদ, আফিম, গাঁজা এবং অন্যান্য নিদ্রাকারক দ্রব্যের উপর কর; সাধারণ বিক্রয় কর; বিদ্যুৎ কর; বৃত্তি, ব্যবসা, পেশা এবং চাকরির উপর কর; বিলাসদ্রব্য ও আমোদ-প্রমোদের উপর কর; যানবাহন কর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কেন্দ্রীয় তালিকা:

কেন্দ্রীয় তালিকায় ১৩টি বিষয় আছে। কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোম্পানী কর, উৎপাদন কর, কৃষি ব্যতীত অন্যান্য আয়ের উপর কর, বাণিজ্য শুল্ক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভারতে অবশিষ্ট সকল বিষয়ে কর ধার্য করার ক্ষমতা কেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে এবং রাজস্ব বন্টনের ক্ষেত্রে কোন যুগ্মতালিকার সংস্থান নেই।

কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি থেকে সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্র এককভাবে পুরোপুরি ভোগ করে না। কখনও সমগ্র আয়, কখনও আয়ের অংশ রাজ্য সরকারকে দিতে হয়। এদিক থেকে বিচার করলে কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত করগুলিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই সমস্ত বিষয়ে সংবিধানের ২৬২ থেকে ২৭২ ধারার মধ্যে উল্লেখ আছে।

(ক) কেন্দ্র আরোপ করে; সংগ্রহ ও ভোগ করে রাজ্য:

কতকগুলি কর আছে যা আরোপ করে কেন্দ্র, সংগ্রহ ও ভোগ করে রাজ্যগুলি। স্ট্যাম্প কর, ঔষধপত্র ও প্রসাধান সামগ্রীর উপর কর এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অঙ্গরাজ্যগুলি যে যার নিজের এলাকার মধ্যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে রাজস্ব সংগ্রহ ও ভোগ করতে পারে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে কিন্তু এই কর ধার্য ও সংগ্রহ করে কেন্দ্র (২৬৮ ধারা)।

(খ) কেন্দ্র আরোপ ও সংগ্রহ করে; রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টিত হয়:

কতকগুলি কর আরোপ ও সংগ্রহ করে কেন্দ্র, কিন্তু সংগৃহীত অর্থ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টন করা হয়। এই বন্টনের নীতি নির্ধারিত হয় পালামেন্ট প্রণীত আইনের মাধ্যমে। অ-কৃষি সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকার কর ও সম্পত্তি কর, রেলপথে যাত্রী ও দ্রব্যাদির ভাড়ার উপর কর, সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপনের উপর কর প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত (২৬৯ ধারা)।

(গ) কেন্দ্র আরোপ ও সংগ্রহ করে; কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বন্টিত হয়:

কতকগুলি কর আছে যা কেন্দ্রীয় সরকার আরোপ ও সংগ্রহ করে, কিন্তু সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টিত হয়। আয়কর ও কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক এই শ্রেণীভুক্ত। এ ক্ষেত্রে বন্টনের নীতি পার্লামেন্ট নির্ধারণ করে না। অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত নীতি এবং পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত অনুসারে ঐ অর্থ বন্টনের ব্যবস্থা করা হয় (২৭০ ধারা)। তবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ থেকে সংগৃহীত আয়কর এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বেতনাদির উপর কর বন্টন করা হয় না।

(ঘ) ঔষধ ও প্রসাধন সামগ্রী ছাড়া অন্যান্য জিনিসের উপর কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক সূত্রে সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্র প্রয়োজন মনে করলে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বন্টন করতে পারে। আইনের মাধ্যমে পার্লামেন্ট এই বন্টনের নীতি স্থির করে। তবে এই বন্টন বাধ্যতামূলক নয়। এ ক্ষেত্রে বন্টন কেন্দ্রের বিবেচনার উপর নির্ভরশীল (২৭২ ধারা)।

(ঙ) কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত অন্যান্য সকল বিষয়ে কেন্দ্র এককভাবে কর আরোপ, সংগ্রহ ও ভোগ করে। কোম্পানী কর, কোম্পানীর সম্পত্তির মূলধনের উপর ধার্য কর, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক প্রভৃতি এই পর্যায়ভুক্ত। তা ছাড়া ২৬৯ এবং ২৭০ ধারায় উল্লিখিত কর ও শুল্কের উপর কেন্দ্র অতিরিক্ত কর ও শুল্ক ধার্য করতে পারে (২৭১ ধারা)। এই সূত্রে সংগৃহীত অর্থ কেন্দ্র এককভাবে ভোগ করবে।

অঙ্গরাজ্যের কর ধার্যের ও রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা: কর্তৃক

আবার রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়সমূহে অঙ্গরাজ্যগুলির কর আরোপের ক্ষমতা অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত নয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। (**ক**) মূল সংবিধানের ২৭৬ ধারা অনুসারে রাজ্য কোন ক্ষেত্রেই বছরে ২৫০ টাকার বেশী বৃত্তি, পেশা বা চাকরির উপর কর আরোপ করতে পারবে না। সংবিধানের ৬০তম সংশোধনী আইন(১৯৮৮) অনুসারে এই পরিমাণ ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫০০ টাকা করা হয়েছে। **(খ)** রাজ্যে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পত্তির উপর রাজ্য সরকারের কর ধার্য করার ক্ষমতা পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের অনুমোদনসাপেক্ষ (২৮৫ (১) ধারা)। (**গ**) আমদানী বা রপ্তানীর উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের উপর রাজ্য সরকার কোন বিক্রয় কর ধার্য করতে পারে না (২৮৬ (১) ধারা)। (**ঘ**) ভারত সরকার বা ভারত সরকারের কোন

সংস্থা যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া রাজ্যগুলি তার উপর কোন বিদ্যুৎ কর আরোপ করতে পারে না (২৮৭ ধারা)। যেমন-রেলওয়ের জন্য ব্যবহৃত বিদ্যুতের উপর কর ধার্য করা যায় না। (**ঙ**) আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সকল দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় পার্লামেন্ট কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়, সেই সকল দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের উপরও রাজ্য কর আরোপ করতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে পার্লামেন্ট কর্তৃক আইনের মাধ্যমে আরোপিত শর্তাদি পালন করতে হয়। **(চ)** সংবাদপত্র ছাড়া যে সব জিনিসের আন্তঃরাজ্য বাজার আছে সে সব জিনিসের উপর কেন্দ্র কর ধার্য করবে। **(ছ)** ২৮৮ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির আগাম সম্মতি ছাড়া কোন অঙ্গরাজ্য আন্তঃরাজ্য নদী বা নদী-উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ বা গঠন করার জন্য পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের সাহায্যে গঠিত কোন সংস্থা কর্তৃক মজুতকৃত জল বা বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বন্টন বা বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করতে পারে না। (**জ**) রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব বন্টন সম্পর্কিত ২৬৮ ও ২৬৯ ধারার সকল বা যে-কোন বিষয়ের প্রয়োগ স্থগিত রাখতে পারেন। যে আর্থিক বছরে সংশ্লিষ্ট জরুরী অবস্থার অবসান হয় তারপর রাষ্ট্রপতির সংশ্লিষ্ট নির্দেশ আর কার্যকর থাকে না (৩৫৪ ধারা)। **(ঝ)** আর্থিক জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকাকালীন সময়ে রাজ্য আইনসভায় গৃহীত অর্থবিল তাঁর অনুমোদনের জন্য সংরক্ষণ করতে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিতে পারেন [৩৬০ (৪) ধারা)। **(ঞ)** অঙ্গরাজ্যগুলি বিভিন্ন উপায়ে প্রাপ্ত অর্থ কীভাবে ব্যয় করল তার হিসাব পরীক্ষার ক্ষমতা পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা-পরীক্ষকের হস্তে ন্যস্ত করতে পারে। আর এরকম আইন না থাকলে রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে অডিটর-জেনারেল অঙ্গরাজ্যগুলিকে হিসাব-পত্র রক্ষার ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারেন।

(২) কেন্দ্রীয় অনুদান:

অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের মত ভারতে অঙ্গরাজ্যগুলির রাজস্ব ঘাটতি পুরণ এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্য (Grants-in-aid) দেওয়ার সংস্থান সংবিধানে আছে। অর্থ সাহায্য দু'প্রকারের হতে পারে নির্দিষ্ট সাহায্য (specific grants) এবং সাধারণ সাহায্য (general grants)। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য বা অঙ্গরাজ্যগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব সমতা সৃষ্টির জন্য কেন্দ্র সাধারণ সাহায্যের ব্যবস্থা করে। কেন্দ্রীয় অনুদান সম্পর্কে ২৭৫ ধারায় উল্লেখ আছে। ভারতীয় সংবিধানে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা আছে।

(ক) পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও অসমে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্যের কথা সংবিধানে বলা হয়। সংবিধানের ২৭৩ ধারায় এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। তৃতীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে এই অনুদানের ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

(খ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অনুন্নত ও তফসিলী অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্র অর্থ সাহায্য দিতে পারে। তফসিলী উপজাতিদের কল্যাণ সাধন বা তফসিলী অঞ্চলের প্রশাসনিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রাজ্য যদি কেন্দ্রের অনুমোদন সহ কোন প্রকল্প গ্রহণ করে তবে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প রূপায়ণের জন্য কেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় অনুদান দিতে হয়। এগুলিকে নির্দিষ্ট বা বিশেষ সাহায্য (specific grant) বলা হয়।

(গ) জনস্বার্থে রাজ্যকে অনুদান ও ঋণ প্রদানের ক্ষমতা কেন্দ্রের আছে (২৮২ ধারা)। রাজ্যের অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন আছে মনে করলে কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করতে পারে। এগুলিকে স্ব-বিবেচনামূলক অনুদান (discretionary grant) বলা হয়। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা খাতে রাজ্যকে কেন্দ্র যে অনুদান দেয় তা এই পর্যায়ভুক্ত।

(ঘ) তা ছাড়া কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়েই নিজ নিজ আইন-বিভাগীয় এক্তিয়ারের অন্তর্ভুক্ত না হলেও যে-কোন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে অর্থ সাহায্য করতে পারে।